Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-IV, July 2022, Page No.09-18
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ত্রিপুরায় রাজর্ষি উৎসব : ঐতিহ্যে ও সাহিত্যে

জীবনকৃষ্ণ পাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বি.বি.এম.কলেজ, আগরতলা

Abstract

The novel 'Rajarshi' is one of the milestones of Rabindranath's soul bond with the royal family of Tripura.The creator of 'Rajarshi', Rabindranath Tagore is remembered and respected with a festival of remembrance and homage for three days in every year from 25th Baishakh (The birth day of Rabindranath) on the royal premises of Raja Govinda Manikya. Tagore's World's Poet talent was first recognised by Maharaja Birchandra Manikya of Tripura. Towards the end of life, Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya honoured Rabindranath Tagore with the title 'Bharatabhaskar'. 'Rajarshi' festival has been held at the premises of Bhuvaneswari Temple since 2002, with the active initiative taken by the Information and Cultural Affairs department of Tripura. This festival of remembrance and homage to Tagore has entered its 20th year in 2022. Tagore's novel 'Rajarshi' is the main source of this festival in Tripura. 'Rabimangal' by Narendra Kishore Devbarman is probably the first poem dedicated to Rabindranath Tagore, the creator of the novel 'Rajarshi' on the behalf of Tripura.

Key words: Rajarshi, Milestone, Soul bond, Recognised, Bharatabhaskar, Festival.

মেলা ও উৎসবের বৈচিত্র্যে পার্বতী ত্রিপুরা রাজ্য অনন্যা, বারো মাসের তেরো পার্বণ তার কোলে নিয়ত লালিত- পালিত হয়ে চলে৷ বছরের পর বছর আগমনের সাথে সাথে মেলা ও উৎসব তার পিছু পিছু বিভিন্ন ঋতুর সাজি নিয়ে বিচিত্র উপকরণের সম্ভারে উপস্থিত হয়৷ সেই রকম একটি হল রাজর্ষি উৎসব৷ প্রতিবছর ২৫শে বৈশাখ থেকে তিনদিন উদয়পুর শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পূর্ব দিকে পুরাতন রাজবাড়ি ও ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব৷ কৃষ্ণচূড়া ফুলের রক্তিম আভাস, রামধনু মেঘের বর্ণচ্ছটা, গোমতীর রুপোলি শীতল জলের কুলু-কুলুতান 'রাজর্ষি'-র স্রষ্টা বিশ্ববরেণ্য কবিকে স্মরণ করায়৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে রাজর্ষি উৎসবের আয়োজন করা হয়৷ 'রাজর্ষি'---কে, কেন এই নামের মেলা ও উৎসবের আয়োজন---এই সমস্ত প্রশ্ন মাথায় প্রথম কীটের মতো দংশায়৷ রাজর্ষি গোবিন্দ মাণিক্যকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে তাঁরই বাসগৃহের উঠোনে 'রাজর্ষি মুক্তমঞ্চ'-এ এই উৎসবের আয়োজন, নাকি তা 'রাজর্ষি'-র স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি বিশেষ সম্মাননা? দুটি প্রশ্ন দুই মেরুর দিকে আকৃষ্ট করলেও আসলে 'রাজর্ষি উৎসব'একটি সরলরেখা, যে রেখা পার্বতী ত্রিপুরার একজন আদর্শ নৃপতি মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্যকে স্পর্শ করে তাঁর সময়ের প্রায় চারশোর অধিক বছর পর এক উদীয়মান প্রতিশ্রুত কবি-স্রষ্টার সৃষ্টি 'রাজর্ষি'

উপন্যাসের সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে৷ তাই রাজর্ষি উৎসব হল রাজর্ষি গোবিন্দ মাণিক্যের উদার মানবধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মানবতাবাদী স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসকে স্মরণের উৎসব৷ এ উৎসব রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরার আত্মিক সম্পর্কের অচ্ছেদ্য মেলবন্ধনের উৎসব, এ উৎসব রবীন্দ্র-স্নেহধন্য ত্রিপুরাবাসীর হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মাননার উৎসব৷ তাই রাজর্ষি উৎসবের জন্য অপেক্ষা করতে হয়---বছরের নির্দিষ্ট তিনটি দিন কখন আসবে এবং রবীন্দ্র-আগমনের অনুভব নিয়ে কখন কোনও ভাবুক কবির সেই আবেগমণ্ডিত গানের পংক্তি সুরের মূর্ছনায় আকাশ-বাতাস মাতিয়ে তুলবে---''কৃষ্ণচূড়া লাল হয়েছে ফুলে,/তুমি আসবে বলে''৷

রবীন্দ্রনাথের সাথে ত্রিপুরার সম্পর্ক প্রায় ছয় দশকের৷ চার মহারাজা--- বীরচন্দ্র মাণিক্য, রাধাকিশোর মাণিক্য, বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য এবং সর্বশেষ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অমলিন আত্মীয়তায় সম্পৃক্ত ছিল৷ সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ত্রিপুরাবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অন্ত নেই৷ রবীন্দ্রপ্রয়াণের প্রায় আশি বছর পরও রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাবাসীর হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছেন৷ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও প্রয়াণ ত্রিপুরাবাসীর হৃদয়ের পরতে আঁকা আনন্দ ও বেদনা, শ্রদ্ধা ও স্মরণের দুটি বর্ণময় ছবি৷ এই দুটি দিন গ্রাম-শহর ও পাহাড় ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি মানুষদের একসূত্রে বেঁধে ফেলে৷ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হলেও প্রতিটি মানুষের সমবেত প্রয়াসে গ্রাম ত্রিপুরা রবীন্দ্রনাথকে নিষ্ঠাভরে স্মরণ করতে বিন্দুমাত্র খামতি রাখেনা৷ শহরের কথা আলাদা---এখানে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা হয় নাগরিক বৈদগ্দ্যে, সাংসৃকতিক ঐতিহ্যে এবং বর্ণময় শোভাযাত্রা আয়োজন করে৷ শহর আগরতলা সহ প্রতিটি জেলা মহকুমা এবং ব্লকস্তরে রবীন্দ্রস্মৃতি- তর্পণে মানুষের আবেগের সীমা থাকে না৷ উদয়পুরের পুরাতন রাজবাড়ি ও ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে হওয়া 'রাজর্ষি উৎসব' হল রবীন্দ্র-স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি সাংসৃকতিক প্রয়াস৷ এই উৎসবকে সাধারণভাবে রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত করে ফেললে নিতান্ত ভুল করা হবে না বটে, তবে এ উৎসবের গভীরতা অনেক অনেক৷ রবীন্দ্রনাথের সাথে রাজন্য ত্রিপুরার সম্পর্কের কথা উল্লেখ না করলে তার তল খুঁজে পাওয়া যাবেনা৷

সাল ১৮৮১, জুন মাসের তিন তারিখ, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স কুড়ি ছুঁয়ে একুশে পদার্পণ করছে৷ এই বয়সে তিনি চারটি গ্রন্থ লিখে ফেলেছেন---'কবিকাহিনী', (কাব্য-১৮৭৮), 'বনফুল' (কাব্য-১৮৭৯), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (গীতিনাট্য-১৮৮১) এবং 'ভগ্নহৃদয়' (কাব্য-১৮৮১)৷ কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত রোমান্টিক কবির স্বপ্নবিভোর চোখে ধরা পড়তে চলেছে প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনার মণি-মাণিক্যরাজি৷ পূর্ণতার পথে যাত্রা করছেন, কিন্তু কোথায় সেই পূর্ণতা, কোথায় সেই অধরা অপ্রাপনীয়া রয়েছে, সব মিলে আনন্দ-বিষাদ তাঁকে ঘিরে রেখেছে৷ বিরহীর বিষণ্ণতা ও বেদনা তাঁর কাব্যপ্রত্যয়কে কখনো কখনো আচ্ছন্ন করে ফেলছে, সমালোচকরা তাঁর সৃষ্টিকর্মকে কীভাবে নিচ্ছে---এই সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সংশয়াকুল অবস্থায় কবি যখন নিজের প্রতিভার সীমানা নির্ধারণ করতে পারছেন না, সেই তরুণ কবির কাছে হঠাৎ পৌঁছলো অপ্রত্যাশিত অভিনন্দনের বার্তা৷ যিনি বার্তা পাঠালেন, তিনি যে সে মানুষ নন তিনি মহাপণ্ডিত, সুরসিক, সঙ্গীত-ললিতকলাবিদ, কবি, দার্শনিক 'বাংলার বিক্রমাদিত্য' ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর৷ রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য পাঠ করে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর পারিষদ শ্রী রাধারমণ ঘোষকে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠালেন---

''মনে আছে এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন৷ কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির

সাহিত্য সাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটা জানাইবার জন্যই তিনি তাঁর অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন৷''(১)

তিনি এই প্রবন্ধে লিখেছেন---

''...'ভগ্নহৃদয়' যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো৷ বাল্যও নয়, যৌবনও নয়৷ বয়সটা এমন একটা সন্ধি স্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই৷ একটু-একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া৷ এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে৷ সত্যকার পৃথিবী একটা আজগুবি পৃথিবী হয়ে ওঠে৷ ...তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিলনা, কেবল নিজের মনটাই ছিল তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত৷''(২)

এই তরুণ দোদুল্যমান কবি-প্রতিভাকে বীরচন্দ্র মাণিক্য জহুরির মতো চিনতে পেরেছিলেন৷ রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যখানি সদ্যপ্রয়াত (১২৮৯ বঙ্গাব্দে) প্রিয়তমা পত্নী ভানুমতী দেবীর শোকে মুহ্যমান মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের হৃদয়ে সান্ত্বনার একমাত্র আশ্রয় জাগিয়ছিল৷ তাই মহারাজা এই অজ্ঞাতনামা তরুণ কবিকে সম্মান জানানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন৷ বীরচন্দ্রের সাথে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের তেমন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না৷ তিনি একসময় তাঁর পিতৃদেব মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের মুখে শুনে ছিলেন---

''মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য কোন গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া কলিকাতায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যার্থী হন৷ প্রিন্স দ্বারকানাথ (রবীন্দ্রনাথের পিতামহ) তখনকার কলিকাতা সমাজের এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নেতা৷ তাঁহার-ই সহায়তায় মহারাজ কৃষ্ণকিশোর সে যাত্রায় সফলকাম হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন৷ সেই সময় ত্রিপুর রাজ পরিবারের সহিত জোড়াসাঁকোর রাজপরিবারের প্রথম পরিচয় হয়৷'' (৩)

মহারাজা বীরচন্দ্রের দেওয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই সম্মাননা ছিল যথার্থভাবে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বীকৃতিলাভ৷ সেই দিন থেকে ত্রিপুরার মাটি-জল-আকাশ-বাতাস-মানুষজন এবং রাজন্যবর্গ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে একটি স্থায়ী আসন পেল৷ রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী হয়ে উঠলেন ত্রিপুরা সম্পর্কে৷ বীরচন্দ্রের আমন্ত্রণে তিনি তাঁর সাথে কার্শিয়াং যাত্রার সঙ্গী হলেন৷ কার্শিয়াং-এ অবকাশ সময়ে---

''আমার বেশ স্মরণে আছে৷ রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া যাইত, অবিশ্রামভাবে মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সঙ্গীত এবং কাব্য আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী প্রকাশ করিবার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেন৷''(৪)

পিতৃতুল্য রাজা আর পুত্রতুল্য কবির মধ্যে এই সম্পর্ক নির্দিষ্ট বন্ধনে বা বিশেষণে বাঁধা সম্ভব নয়৷ সম্পর্কের নিবিড়তায় কবি রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে ভূমিষ্ঠ হল---'রাজর্ষি' উপন্যাস, 'বিসর্জন' নাটক, 'মুকুট' ছোটগল্প ও নাটিকা৷ ত্রিপুরার মাটি, রাজ-পাট, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কবির মানসপটে একটা স্থায়ী চিত্র রচনা করল৷ ত্রিপুরায় পদার্পণ না করেই তিনি 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন' রচনা করলেন৷ রাজর্ষি রচনার সময় কবি পিতৃপ্রতিম মহারাজাকে অনুরোধ পত্রে লিখলেন---

''মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া 'রাজর্ষি' নামের একটি উপন্যাস লিখিতেছি৷ কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই৷ তাহার কারণ, ইতিহাস পাই নাই৷ এজন্য আপনার কাছে মার্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি৷ এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দ মাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিব৷''(৫)

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে মহারাজাকে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর এবং অন্যান্য স্থানের ফটোগ্রাফ পাঠানোর জন্যও অনুরোধ করেন৷ মহারাজা অবিলম্বে 'রাজরত্নাকর,' 'রাজমালা' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতিলিপি সহ কিছু ছবি পাঠিয়ে 'প্রণত' নিবেদনে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন---

''আপনি যে ত্রিপুরার ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নবন্যাস লিখিতে যত্ন করিতেছেন, ইহাতে আমি চির কৃতজ্ঞ রহিলাম৷ যে যে স্থলে ইতিহাসের সহায়তা প্রয়োজন হয়---আমি আদরের সহিত পূর্বেবাক্ত নানা মূল হইতে তাহা সংকলন করিয়া দিতে প্রস্তুতি আছি৷''[৬]

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর কার্শিয়াং থেকে কলকাতা ফেরার পথে মহারাজা বীরচন্দ্রের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত হলেন৷ ভাবলেন, এই মৃত্যু তাঁর সাথে ত্রিপুরার রাজবংশের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল৷ তা হওয়ার সম্ভাবনা থাকল না, কারণ মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য তরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর পিতার স্নেহ ও শ্রদ্ধাকে মর্যাদা দিলেন এবং নিজেই কবির সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্কে বাঁধা পড়লেন৷ রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় এসেছেন মোট সাতবার৷ তার মধ্যে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের সময় পাঁচবার৷ ১৮৯৭ সালের মার্চ মাসের ৫ তারিখ রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে আরোহন করলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানালেন ত্রিপুরায় রাজ-আতিথ্য গ্রহণের জন্য৷ রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৯ সালে মার্চ মাসে বাসন্তিক পরিবেশে ত্রিপুরায় প্রথম পদার্পণ করলেন৷ মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজ্যাভিষেক হওয়ার সময় থেকে তাঁর রাজত্বকালে ত্রিপুরা ছিল অর্থশূন্য, রাজপরিবারে এবং পারিষদবর্গের মধ্যে ছিল মানসিক বিরোধ, ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদের হয়েছিল বিরাট ক্ষতি---এই সমস্ত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মহারাজের পাশে দাঁড়িয়েছেন, মানসিক সহযোগিতা করেছেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বৈষয়িক বিষয়ে তিনি যোগ্য পরামর্শ দিয়েছেন, এমনকি জোড়াসাঁকোতে সুহৃদ মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজোচিত সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন৷ মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের অকাল প্রয়াণের দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজপরিবারে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন৷ যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোরকে রাজ্যাভিষেক করিয়ে রাজভ্রাতা ব্রজেন্দ্র কিশোরের সাথে মধুর সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসনিক কার্যাদি সুন্দর এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছিলেন৷ মহারাজা রাধাকিশোর ও মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরের সময় ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থনৈতিক সংস্কারক হিসেবে তিনি 'কৌটিল্যের ভূমিকা' পালন করেছিলেন৷ শুধু তাই নয় রাজপুত্রদের পড়াশুনা, রাজপরিবারের অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষাদান বিষয়ে তিনি নিয়মিত পরামর্শ দিয়ে গেছেন, এমনকি নিজেই যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন৷ কিন্তু বীরেন্দ্রকিশোরের আকস্মিক মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে ব্যথাহত করে দিল৷ মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের পর ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে অভিষেক করলেন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর, যিনি পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের সান্নিধ্যপুষ্ট রবীন্দ্রনাথকে সাদরে শ্রদ্ধার আসনে বসালেন এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে সম্মানিত করলেন, বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখলেন না৷

রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজপরিবারের সাথে একান্তভাবে যুক্ত থেকে যেমন সম্মানিত হয়েছেন, তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজানুকূল্য পেয়েছেন, তা অবশ্য নিজের জন্য নয়৷ বিশেষ করে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার অনুকূলে যেভাবে মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন সার্বিক কল্যাণের জন্য, তা বর্ণনার অতীত৷ রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেছেন৷ 'রবি' পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ৪থ সংখ্যা ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'কবি-সম্রাটের বাণী'-তে আমরা পাই, ''রাধাকিশোর

মাণিক্যের মত এত বড় নীরব দাতা পাওয়া বড়ই কঠিন''। রাধাকিশোর মাণিক্যের সীমাহীন অবদানের কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে---

''একথা সত্যি রাধাকিশোর মাণিক্য রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের চারজন মহারাজার মধ্যে একজন, যিনি নিজের রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে থেকেও শিক্ষা-সংস্কৃতি-জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতির স্বার্থে নীরবে এবং অকাতরে দান করে গেছেন। তাঁর দান গ্রহীতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একজন, যিনি কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ধত্ব প্রাপ্তির কারণে তাঁর ভরণ-পোষণ বাবদ মাসিক ৩০ টাকা করে রাজানুকূল্য নিয়েছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান গবেষণার জন্য বিলাত যাত্রা উপলক্ষ্যে ২০ হাজার টাকা এবং পরবর্তীকালে একই উদ্দেশ্যে আরও সহযোগিতা নিয়েছেন রাজানুকূল্য প্রাপ্তি হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ রাজানুকূল্য পেয়েছেন শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান গবেষণার যন্ত্রাদি কেনার জন্য। ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বাৎসরিক ধার্য ১০০০ টাকা নিয়মিত গ্রহণের মাধ্যমে তিনি রাজানুকূল্য পেয়েছেন। রাজানুকূল্য তিনি তখনও পেয়েছেন যখন থেকে নিয়মিত বৃত্তি দিয়ে রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার ছাত্রদের পাঠ গ্রহণের জন্য শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছেন।'' (৭)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের থেকে সহযোগিতার সমস্ত আশ্বাস পেয়েছেন।

রাজর্ষি উৎসব সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সাথে ত্রিপুরার সম্পর্কের বিরাট অধ্যায়ের আলোচনা শেষ হবেনা। তবু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা খণ্ডিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। যেমন, বিংশতি বর্ষের 'উদীয়মান ও প্রতিশ্রুত' কবিকে অভিনন্দন ও সম্মাননা জানিয়ে ছিলেন ভূয়োদর্শী মহারাজা বীরচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যতে একজন মহান কবি হয়ে উঠবেন, তা ক্রান্তদর্শী মহারাজা বীরচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই পার্বতী ত্রিপুরা রাজ্যই রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবে রাজসিক সম্মান প্রথমে দিয়েছিল। সবচেয়ে মজার কথা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ উপলক্ষ্যে ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৮ সালে ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য রবীন্দ্রনাথকে 'ভারতভাস্কর' উপাধিতে বিভূষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ত্রিপুরার রাজদরবারে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালনের সময়। ঠিক পাঁচদিন পর ৩০শে বৈশাখ শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণে আয়োজন করা হয় একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। ত্রিপুরার মহারাজা কবিকে 'ভারতভাস্কর' সম্মাননা প্রদান করে সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে কৃতজ্ঞতার জালে রবীন্দ্রনাথের কাছে বেঁধে দিলেন এবং নিজেই সম্মানিত হলেন। 'ভারতভাস্কর' প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ (রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন) দিয়েছিলেন, তার সামান্য অংশ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে---

''ত্রিপুরার রাজবংশ থেকে একদা আমি যে অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছিলাম, আজ তা বিশেষ করে স্মরণ করবার ও স্মরণীয় করবার দিন উপস্থিত হয়েছে। এরকম অপ্রত্যাশিত সম্মান ইতিহাসে দুর্লভ। যেদিন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এই কথাটি আমাকে জানাবার জন্য তাঁর দূত আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন যে তিনি আমার তৎকালীন রচনার মধ্যেই একটি বৃহৎ ভবিষ্যতের সূচনা দেখেছেন সে দিন একথাটি সম্পূর্ণ আশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল। ... বুঝতে পারলুম তাঁর বংশগত রাজ উপাধি আজ বাংলাদেশের সর্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হলো। এর সঙ্গে বঙ্গলক্ষ্মীর সকরুণ আশীর্বাদ চিরকালের জন্য তাঁর রাজকুলকে শুভ শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত করে রাখল। ... সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে রাজহস্ত

থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ্য পেলাম তা সগৌরবে গ্রহণ করি এবং আশীর্বাদ করি এই মহাপুণ্যের ফল মহারাজের জীবনযাত্রার পথকে উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণের দিকে যেন অগ্রসর করতে থাকে৷'' (৮)

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ২২শে পৌষ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে মহারাজা বীরবিক্রমকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন৷ সেই সম্বর্ধনাবাণীতে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের প্রতি রবি-কবির বিনয়, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে । তিনি অত্যন্ত গৌরবান্বিত হয়েছেন এবং রাজ পরিবারের মঙ্গল কামনায় তাঁর আশীর্বাদ সর্বান্তঃকরণে প্রদানও করেছেন---

''আজ তোমার আগমনে সেদিনকার সুখস্মৃতির দক্ষিণ সমীরণ তুমি বহন করে এনেছ৷ আজ তুমি বর্ত্তমান দিনকে সেই অতীতের অর্ঘ্য এনে দিয়েছ, এই উপলক্ষ্যে তুমি আমার স্নিগ্দ হৃদয়ের সেই দান গ্রহণ করো যা তোমার পিতামহদের অর্পণ করেছিলুম, আর গ্রহণ করো আমার সবর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ৷'' (৯)

এবার আসি রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরার আত্মিক বন্ধনের প্রতীক 'রাজর্ষি উৎসব' প্রসঙ্গে৷ উদয়পুর ছিল ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী৷ ৫৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী ছিল উদয়পুর৷ নানা রকমের অসুবিধা, মোঘল আক্রমণ, মগদের বার বার হানা দেওয়া প্রভৃতি কারণে মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন বর্তমান পুরাতন আগরতলা (হাভেলী)তে৷ ফলে প্রায় ১২শো বছরের উদয়পুর তার রাজধানীর কৌলিণ্য হারায়৷ রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর রাজবাড়ি হয়ে গেল জঙ্গলাকীর্ণ, সাপ ও শ্বাপদসঙ্কুল৷ উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে রাজবাড়ি, রাধামাধব মন্দির, ভুবনেশ্বরী মন্দির দিনে দিনে লয় প্রাপ্ত হতে শুরু করল৷ এছাড়া মাঝে মাঝে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্প পুরাতন রাজপ্রসাদকে প্রায় ধবংসস্তূপে পরিণত করার চেষ্টা করল৷ যে স্থান এক সময় সৈন্য-সামন্ত, মন্ত্রী, কতোয়াল, পারিষদ, রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত গুণীজন, বিভিন্ন রাজকর্মচারির উপস্থিতিতে মহাসমারোহে ভরে যেত আর অস্ত্রের ঝন্-ঝনানি, রক্তপাতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত সেই স্থান হয়ে গেল একেবারে নির্জন এবং প্রায় পরিত্যক্ত৷ যেখানে একে একে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ, বিদ্রোহ-বিদ্রোহ দমন, শাক্ত-বৈষ্ণবের সংঘাতে রক্তাক্ত হতো এবং যেখানে চতুর্দশ দেবদেবীর কাছে এমন কী ভুবনেশ্বরী মন্দিরে বিজিত সৈন্যকে বন্দী করে রেখে বলি দেওয়া হতো, সেই স্থান হয়ে গেল একেবারে ছন্নছাড়া! ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! যে স্থান রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বপ্নপুরী ছিল, ত্রিপুরায় প্রথম পদার্পণের প্রায় তেরো বছর আগে সে স্থানকে কল্পনার চোখে দেখে তাঁর 'রাজর্ষি' উপন্যাস লিখলেন এবং অন্তরের শ্রদ্ধা কোথাও ম্লান হয়ে যেতে পারে ভেবে চর্মচোখে যে স্থানকে না দেখার বাসনা প্রকাশ করলেন---সেই স্থান হয়ে গেল একেবারে ধূল্যবলুণ্ঠিত! রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট এইস্থান৷ এইস্থানকে কবি স্বপ্নে দেখে তাঁর উপন্যাসের পরিকল্পনা করলেন৷ সূচনা ও উপসংহার সহ ৪৪টি পরিচ্ছেদে তাঁর 'রাজর্ষি' ভূমিষ্ঠ হল স্বপ্নের কল্পনা জালে৷ যদিও পরবর্তীকালে তিনি মহারাজা বীরচন্দ্রের সহযোগিতা নিয়েছিলেন, তবু তাঁর স্বপ্নলব্ধ সৃষ্টি 'রাজর্ষি' উপন্যাসের সূচনা অংশে তিনি জানাচ্ছেন যে, 'বালক' পত্রের নিয়মিত লেখককে প্রতিটি সংখ্যা লেখায় ভরাতে হবে৷ একটু সময় পেলেই তাঁর মন 'কী লিখি?' 'কী লিখি?' ভাবনায় ডুবে থাকে৷ একদিন দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুকে দেখতে যাবার জন্য ট্রেনে চাপলেন তিনি৷ ট্রেনে পাশের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সহযাত্রীর কারণে তাঁকে জাগতে হল৷ ভাবতে লাগলেন---গল্পের প্লটের কথা৷ এমন সময়---

''ঘুম এসে গেল৷ স্বপ্নে দেখলুম---একটা পাথরের মন্দির৷ ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে৷ সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে৷ দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়! কী

বেদনা! বাপকে সে বার বার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা, এত রক্ত কেন! বাপ কোনো মতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল৷ জেগে উঠেই বললুম, গল্প পাওয়া গেল'' (১০)

'রাজর্ষি' উপন্যাস পাঠ করে আমরা রবীন্দ্রনাথের সেই স্বপ্নের প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করি৷ এক আষাঢ় মাসের সকাল বেলা আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে৷ বৃষ্টি পড়ছিল না, কিন্তু ঝড়বাদলা হওয়ার পূর্বপ্রস্তুতি চলছিল৷ দূরে কোথাও যে বৃষ্টি হচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টি কণায় ভরা শীতল বাতাসের বহমানতায়৷ গোমতী নদীর উভয়তীরের বনভূমির অন্ধকার আকাশের ছায়া গোমতী নদীর জলে পড়েছে৷ গতকাল রাত্রির অমাবস্যার পুজো ভুবনেশ্বরী মন্দিরে সমাপন হয়েছে৷ এমন এক সকালে রাজা স্নান করতে চলছেন হাসি ও তাতার হাত ধরে---

> ''যথা সময়ে হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিয়াছেন৷ একটি রক্তস্রোতের রেখা শ্বেতপাথরের ঘাটের সোপন বাহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে৷ কাল রাত্রে যে একশো এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত৷
> হাসি সেই রক্তের রেখা দেখিয়া সহসা এক প্রকার সংকোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কিসের দাগ বাবা' রাজা বলিলেন, 'রক্তের দাগ মা!'
> সে কহিল, 'এত রক্ত কেন!''
> ... একটি ছোটো মেয়ের প্রশ্ণ শুনিয়া তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল, 'এত রক্ত কেন!'' (১১)

আসলে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মানবতাবাদী আদর্শ নিয়ে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার৷ সেই সূত্রে তিনি ইতিহাসের একটি আদর্শ অধ্যায় খুঁজে পেলেন ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসে৷ এই উপন্যাসে ঐতিহাসিকতা বজায় রাখার জন্য তিনি খাঁটি ঐতিহাসিক চরিত্র---যাঁরা এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের উপস্থাপন করলেন৷ তাঁরা হলেন---মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য, মহারানি গুণবতী, রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়, শাহসুজা, আরাকান রাজা প্রমুখ৷ ইতিহাসকে সত্যের আলোকে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনৈতিহাসিক চরিত্রকে এনেছেন, তাঁরা হলেন---কেদারেশ্বর, জয়সিংহ, বিল্হন ঠাকুর, হাসি, ধ্রুব, তাতা, অপর্ণা, রঘুপতি প্রমুখ৷ রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও সত্যধর্মের পূজা নিবেদন করেছেন এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোবিন্দ মাণিক্যের মাধ্যমে৷ মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় ঐতিহাসিক ব্যক্তিপুরুষ গোবিন্দ মাণিক্যের মধ্য দিয়ে রাজধর্মের প্রকৃত আদর্শকে প্রতিফলিত করেছেন৷ জীব হত্যা নয়, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব নয়, হিংসা ও নিষ্ঠুরতা নয়, ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতা নয়---আমাদের প্রয়োজন প্রেম, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও ত্যাগের আদর্শ৷ ক্ষমা, করুণা ও সাম্যভাবনার মধ্য দিয়ে প্রকৃত রাজধর্ম তার গতিময়তা পায়৷ রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসে আমরা এই সমস্ত ভাবনার প্রতিফলন দেখি৷ মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্যের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ঋষি ও রাজার প্রকৃত সমন্বিত রূপ আমরা দেখতে পাই, তাই তিনি হলেন রাজর্ষি৷ এই 'রাজর্ষি'-ই রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নায়ক, তাঁর মানবতাবাদী ভাবনার প্রতিনিধি৷

ত্রিপুরাবাসী এই 'রাজর্ষি'র স্রষ্টা ঋষি-কবির সান্নিধ্যে ধন্য৷ তাঁরা কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁকে মননে জাগ্রত রাখতে তাঁর আদর্শ ও সৃষ্টিকর্মকে শ্রদ্ধারসাথে সম্মান দিয়ে চলেন৷ আর তা না হলে প্রায় অবহেলিত উদয়পুরের প্রাচীন রাজবাড়ি ও রাজবাড়ির স্থাপত্যশৈলী আজ নবরূপে রূপায়িত হতো না, রাজবাড়ির পাশে 'রাজর্ষি মুক্তমঞ্চ' প্রতিষ্ঠা করে রবীন্দ্র-সংস্কৃতিকে মান্যতা দেওয়া হতো না আর এই মুক্ত মঞ্চ ও তার

সন্নিহিত অঞ্চল প্রতিবছর রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তিনদিন সাজো সাজো হয়ে উঠতো না, লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠতো না, মানুষে মানুষের মিলন, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের একটি সাংস্কৃতিক প্রয়াস 'রাজর্ষি উৎসব' হয়ে উঠতো না৷

উদয়পুরের পুরাতন রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব দিবস উপলক্ষ্যে অনেক আগে থেকে নিতান্ত সাদা-মাটা হলেও স্থানীয় রাজনগর ব্লকের সাধারণ মানুষ রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করতেন৷ এই সাদা-মাটা উৎসব রাজকীয় আভিজাত্য পায় ত্রিপুরা সরকারের সরাসরি সহযোগিতা পাওয়া থেকে৷ ২০০২ সালে তৎকালীন ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী অনিল সরকারের ইচ্ছা ও ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রথম রাজর্ষি উৎসব-এর আয়োজন হয়৷ সেই হিসেবে ২০২০ সালে ১৮তম বর্ষে রাজর্ষি উৎসব পদার্পণ করল৷ মন্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রস্মৃতিধন্য ত্রিপুরাবাসী যেন রবীন্দ্রনাথকে না ভুলে বসেন৷ কারণ, রবীন্দ্রনাথের সাথে ত্রিপুরার সম্পর্ক নিবিড় ও অন্তর্লীন৷ তাই প্রতিবছর স্থানীয় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে, ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় রাজর্ষি উৎসব হয়৷ তাছাড়া ভগ্নপ্রায় রাজন্য কীর্তিসমূহকে পুরনো ঐতিহ্যে নতুন রূপে গড়ে তোলার জন্য দিল্লির একটি Architect সংস্থা নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে নবরূপে রাজকীয় কীর্তিসমূহ আমাদের সামনে প্রতিভাত করেছেন---এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা৷

রবীন্দ্রনাথ শুধু 'রাজর্ষি', 'বিসর্জন' 'মুকুট' লিখে ত্রিপুরার প্রেক্ষাপটকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তিনি তাঁর সুরের অঞ্জলি নিবেদন করেছেন ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর ছয়টি গান রচনা করে৷ সেই গানের প্রথম পংক্তিগুলি উল্লেখ না করলে মন অতৃপ্ত থেকে যায়৷ গানগুলির প্রথম পংক্তি হল :

১৷ ''আপনহারা মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধরে---''
২৷ ''দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা হৃদয় আকাশে,---''
৩৷ ''ফাগুনের নবীন আনন্দে গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে৷৷''
৪৷ ''এসো আমার ঘরে এসো
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে৷৷''
৫৷ ''বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি৷''
৬৷ ''অনন্তের বাণী তুমি, বসন্তের মাধুরী উৎসবে''

৬ সংখ্যক গানটির 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে উল্লেখ নেই, কিন্তু দিলীপ চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা---একটি বহুমুখী সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে৷

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ত্রিপুরাবাসীর আবেগের অন্ত নেই৷ রবীন্দ্র-চিন্তা-চেতনা চর্চার পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্পী সহিত্যিকগণ রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন আঙ্গিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং করে চলছেন৷ এখানে সবকিছু উল্লেখ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে৷ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম একটি কবিতা রচনা হয়েছিল বহুকাল আগে---এখন সে কবিতাটির পাণ্ডুলিপি দুর্লভ৷ সেই কবিতাটির নাম 'রবি মঙ্গল'৷ এখানে কবিতাটির খণ্ডিত অংশ উল্লেখ না করলে রাজর্ষি উৎসব বিষয়ে আলোচনা যেন অপূর্ণ থেকে যায়৷ বাংলা ১৩১২ সালে রাধাকিশোর মাণিক্যের আমন্ত্রণে ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনী সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন৷ এই সাহিত্যসভা স্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠা পায় মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সময় 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' গঠনের মধ্য দিয়ে৷ 'কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত 'রবি'

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্র-অনুরক্ত কবি শ্রী নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা 'রবিমঙ্গল' কবিতা লেখেন। তাঁর চোখে রবীন্দ্রনাথ যেন দেবদূত, এখানে কবিতাটি উল্লেখ করি---

''জয় জয় জয় অমল উজ্জ্বল
উদয়াচলের রবি।
তোমার আলোকে লুপ্ত আঁধারে
দেখা'লে বিচিত্র ছবি।
নবীন উল্লাসে নিখিল আকাশে
উঠে শুধু কুহরণ।
সঞ্চিত তিমিরে কিরণ কৌতুকে
কি সুন্দর জাগরণ!
বিশ্বভারতী ধরিয়া মূরতি
মেলে আঁখি কৌতূহলে।
জ্ঞানী গুণী যত বিনয়াবনত তোমার আঙিনা তলে।
কাঁদিয়া উঠিল আদি কবিগুরু
ক্রৌঞ্চবধূর লাগি
সে বারতা দ্রুত পুলক আনিল
তোমার কিরণ লাগি।
কালিদাস কবি চণ্ডী ভারবি
গাহি কত যে গান
হাসিয়া কাঁদিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া
যত বিচিত্র আখ্যান।
তুমি দ্বন্দ্বহীন, সবারে ফুটালে
আপন জ্যোতির মাঝে,
যত সুখ-দুঃখে অপার গৌরবে
তোমার ভাণ্ডার রাজে।
পশ্চিম গগনে যেথা যাও তুমি
হে চির উদীয়মান,
সমান আলোকে বিপুল পুলকে
ভরিল সবার প্রাণ।
হেরিল তোমারে সেই দেশবাসী
বিস্ময়ে কৌতুকময়,
ভক্তি অর্ঘ্য দিয়া করিল তোমারে
গাইল তোমার জয়।
উদয় তোমার উজলিতে ধরা
রহিবে চির উজ্জ্বল,

উদয়াচলের নাহিগো সীমানা...।'' (১২)

এই কবিতাটি পাঠ করলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ত্রিপুরাবাসীর আবেগ কতখানি তা স্পষ্ট হয়। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেন কবির দৃষ্টিতে এক পরিপূর্ণ মানব, যাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্ম হয়ে উঠেছে কাব্যরসের সরোবরে এক একটি প্রস্ফুটিত কমল, যেগুলির সৌরভ পূর্ব বা পশ্চিম দিগন্ত শুধু নয়, মানব হৃদয়ের পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর যথার্থ সম্মাননা অনুষ্ঠান হল 'রাজর্ষি উৎসব'।

তথ্যসূত্র :

(১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি (সম্পা. বারিদবরণ ঘোষ), পৃ.১৫৩
(২) তদেব, পৃ.১৫৩
(৩) দেববর্মা, কর্ণেল মহিমচন্দ্র, দেশীয় রাজ্য, পৃ.৮৩
(৪) তদেব, পৃ.৮৩
(৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,মহারাজ বীরচন্দ্রকে চিঠি, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, পৃ.২৯৭
(৬) তদেব, পৃ.২৯৮
(৭) পাত্র, জীবনকৃষ্ণ, সাহিত্য চিন্তালোক, পৃ.১৯
(৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,অভিনন্দনপত্র, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, পৃ.২৭৬
(৯) তদেব, পৃ.২৭৫
(১০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাজর্ষি, পৃ.২
(১১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাজর্ষি, পৃ.৫
(১২) দত্ত, রমাপ্রসাদ, রবি পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ, আগরতলা বইমেলা (স্মরণিকা)-২০১১, পৃ.২৮-২৯

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা :

(১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাজর্ষি (রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী), বি.বি. বুক কনসার্ন, কলকাতা, ২০০২
(২) দেববর্মা, কর্ণেল মহিমচন্দ্র, দেশীয় রাজ্য, পৃ.৮৩
(৩) ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতি সম্পাদিত---রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, ত্রিপুরা সরকার, ৩য় মুদ্রণ, ২০১১
(৪) পাত্র, জীবনকৃষ্ণ, সাহিত্য চিন্তালোক, নয়া পুস্তক মহল, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০১৮
(৫) আগরতলা বইমেলা স্মরণিকা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ২০১১
(৬) রাজর্ষি উৎসব স্মরণিকা, উদয়পুর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ২০১৬

তথ্য সহায়তায় :

(১) শ্রী পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী, উদয়পুর, গোমতী, ত্রিপুরা